ইসলামপন্থা ও ঐক্য!

সাজ্জাদ জহির

ইসলামের প্রভাব বিস্তার এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের বহু আলেম, তালেবে ইলম, দাঈ, সংগঠক বিচ্ছিন্নভাবে বা সাংগঠনিকভাবে নানামুখী মেহনত করে চলেছেন। আর যে কোনো আদর্শ, মানহাজ, চিন্তা বা দাওয়াহকে প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক করতে সংগঠিত কর্মসূচি ও মেহনত অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। কিন্তু অনেকের মাঝেই উম্মতের মাঝে বিভিন্ন সংগঠনকে ফিরকা আখ্যায়িত করার দুঃখজনক প্রবণতা বিদ্যমান। এটা ঠিক যে, ইসলামি সংগঠনগুলোর মাঝে জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার উপস্তিতি নেই, এমনটা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু, যে কোনো সুন্দর ও কার্যকর চিন্তাকে সংগঠিত হওয়া ব্যতীত ফলাফল বের করার বিকল্পও মানবেতিহাসে নেই। পাশাপাশি, দুঃখজনকভাবে 'সংগঠন' নামক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণকে উদ্দেশ্যে পরিণত করার মতো আত্মঘাতী ও বিপজ্জনক মানসিকতা ও চর্চা বহু ইসলামি সংগঠন, মাদ্রাসা, খানকা বা মাসলাকের মাঝে মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে গেছে।

যার দরুণ, ইসলামপন্থীদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করা এক বহুল প্রচলিত চিন্তা বা দুশ্চিন্তা হচ্ছে,

"আগে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হলে, ফসল ঘরে তোলা যাবে না। তাই ঐক্য কায়েম করা জরুরী আগে।"

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এমন দাবির কিছু সমস্যা ও সংকট রয়েছে। প্রথমত, সাধারণত এক্ষেত্রে ঐক্য বলতে ধরা হয়, 'একক নেতা বা জামাতের অধীনে সবার জমা হওয়া। সকলের জন্য সকল ক্ষেত্রেই একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট হওয়া।' এমনটা আসলে ভাবতে চাকচিক্যময় লাগলেও, তা আসলে বাস্তবতাবিবর্জিত। কেননা, এমন ঐক্য অর্জন সম্ভব হয় শক্তি ও সফলতার চরম স্তরে পৌঁছানোর পর। কেননা, অধিকাংশ মানুষ শক্তি, সফলতা ও বিজয়ের পরেই কেবল হকের পতাকাতলে একত্রিত হয়। আমাদের মতো দুর্বল ও নিপীড়িত মুসলিম সমাজে ঐক্যের এই ধারণাটি ঘোড়ার আগে গাড়ি লাগানোর মতো হয়ে যেতে পারে।

আসলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জীবনই তো এটা যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই জাতি একত্রিত হবে এবং ব্যক্তিগত ফায়দার দরুণ বিচ্ছিন্ন হবে না। আর এমন জীবন সাধারণত কেবল বিজয় ও কর্তৃত্বলাভের পরেই অর্জিত হয়, আগে নয়। তাই সামগ্রিক ঐক্যকে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা প্যারাডক্সিকাল ও বিপজ্জনক। বরং, প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট আকিদা ও মানহাজকে কেন্দ্র করে সামর্থ্য মোতাবেক মেহনত জারি রাখা আবশ্যক। পাশাপাশি চেষ্টা চলতে থাকবে যোগ্যতম ও সঠিক ব্যক্তি বা সংগঠনের পেছনে একত্রিত হয়ে যাওয়া, যদি পরিস্থিতির উপযুক্ততা উপস্থিত থাকে।

শায়খ আবু বকর লিখেন —

> "আমাদের ইসলামি ইতিহাসের বড় অংশ জুড়ে এক শাসনব্যবস্থার পতন ও অন্য শাসনের উত্থানের যুগসন্ধিক্ষণগুলোতে কিংবা বহিঃশত্রুর আক্রমণের মতো (যেমন তাতারি অভিযানের সময় কিংবা ক্রুসেড অভিযানের সময়) উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নগুলোতে বিভিন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মাঝে কোনো কোনোটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ইমারাহ/রাষ্ট্রকে একীভূত করে শেষে একটি খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। কোন কোনটি পার্শ্ববর্তী এক বা একাধিক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় কিংবা সরাসরি খিলাফাহ'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ, যেমনটি শায়খ আল্লামা আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি উল্লেখ করেছেন, ক্রুসেড চলাকালীন,

খিলাফাহশূন্য সময়গুলোর ব্যাপারে। শায়খ লিখেন—

“অধিকাংশ লেখক, যারা বিরতির (উম্মাহর খিলাফাহশূণ্য বা কর্তৃত্বশূণ্য) সময় ও যুগসন্ধিক্ষণগুলো নিয়ে লিখেছেন, তারা তার প্রতিকার বিধানে, কেবলমাত্র সে সকল ব্যক্তির অবদানকেই তুলে ধরেছেন, যারা নিজেদের পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন মেহনত, ভূমিকা ও বিচিত্র প্রয়াসকে একীভূত করে যুগান্তকারী কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

আমরা কোনো কোনো লেখককে দেখি, সকল অবদান একমাত্র নেতা নুরুদ্দীন জঙ্গীর বলে দাবি করেন, কিংবা কেবল সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বলে দাবি করেন ইত্যাদি।

এতে করে মানুষের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের মহান অধ্যায়টি রচিত হয়েছে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে, যা গোটা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

অথচ এমন ধারণা স্পষ্ট ভুল।

খিলাফতশূণ্য বা তামকিনশূণ্য এই সময়গুলোর ইতিহাস যে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে, তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, ‘মুসলমানরা সে সময় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে, বিক্ষিপ্ত সংগঠনে বিভক্ত হয়ে তবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।’ হয়তো কখনো কোনো দুর্গশহর (সিটাডেল) কোনো এক জামাত দখল করেছে, যার পতাকাতলে কিছু লোক জড়ো হয়েছে, তো তমুক গ্রাম অপর একজন আলেম নেতার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার চারপাশে সমবেত হয়ে প্রতিরোধ করেছে। এদিকে কোনো একজন আলেম তার কিছু ছাত্রকে সংগঠিত করেছেন, যারা তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে, তো অন্য প্রান্তে অপর কেউ এ কাজ করেছে। এভাবেই।

আমি মনে করি, যে গ্রন্থটি সবচেয়ে সুচারুরূপে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে, তা হলো—”আল-ই’তিবার”। এর রচয়িতা আমীর উসামা ইবনে মুনক্বিয। তিনি “শিরায” নামক দুর্গশহরের নেতা ছিলেন। তাঁর বংশ আলে মুনক্বিয এই দুর্গশহর শাসন করেছে।

আমি অন্য একটি পয়েন্টে যাবার আগে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বলে যেতে চাই, তা হলো—নুরুদ্দীন জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহ:)-এর বংশধরদের মত বড় বড় নেতাদের ভূমিকা হলো: বিভিন্ন খণ্ড দল-উপদল ও সংগঠনের মাঝে সমন্বয় করে এক নেতৃত্বের অধীনে সেগুলোকে নিয়ে আসা। এসবের পরেও ক্রুসেড মোকাবেলায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছোটো ছোটো সে সকল দল-উপদলের বিরাট বিরাট স্বতন্ত্র অবদান অনস্বীকার্য। এ সমস্ত ছোট ছোট দল ও সংগঠন, যেগুলো কোন কোন দুর্গ অধিকার করেছে, ছোট ছোট শহর দখলে নিয়েছে, একই সঙ্গে শত্রু শিবিরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, ক্রুসেড মোকাবেলায় এগুলোই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠক! আপনি চাইলে ক্রুসেডগুলোর ইতিহাস বিস্তারিত পড়ে দেখতে পারেন যে, ইলম ও তেহরিকের পথিকদলের দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোই শেষে বড় বড় সংঘাতগুলোতে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।

বিজয়ের ক্ষেত্রে বড় বড় সে সকল সংঘাতের একক কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং হিত্তিনের মতো বড় বড় যুদ্ধগুলো ছোট ছোট এমন অনেক যুদ্ধের ফসল ছিল, যেগুলো ইতিহাসে সেভাবে আসেনি। কিন্তু যুগান্তকারী একটি বিজয়ের জন্য এগুলোই ছিল প্রথম চাল।”[1]

অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম, ইসলামের সম্মান ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট প্রত্যেকটি জামাত, গোত্র, রাষ্ট্র, মতাদর্শ এই উম্মতের এক একটি অংশ। সকলেরই দায়িত্ব হলো: শত্রুদের প্রতিরোধ করা এবং ইসলামকে সমুন্নত রাখা; যা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

পাশাপাশি সকলেরই জন্য যোগ্য একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া কাম্য। অতএব, মুসলিম উম্মাহর সংকটাপন্ন অবস্থা দূরীকরণে ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসৃত নীতি হচ্ছেঃ-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا

> "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একত্রে বের হও।" (সূরা আন-নিসা, ০৪:৭১)

বাস্তবতা এটাই যে, পশ্চিমা সভ্যতা নেতৃত্বাধীন ইসলামের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে গিয়ে যদি এই উম্মাহ অসংখ্য ব্যক্তি বা সংগঠনে বিভাজিত হয়ও; সঠিক সময়ে তাদের সবচেয়ে যোগ্যতম (আমানতদারিতা, পরহেজগারীতা ও বাস্তবতার মানদন্ডে) ব্যক্তি বা দলের অধীনে বাকি সবার জমে যাওয়া এক অনিবার্য বাস্তবতা। যা ইতিহাস বার বার প্রত্যক্ষ করেছে, মক্কা, আন্দালুস, আইনে জালুত, হিত্তিন ও সর্বশেষ কাবুলে! তাই, ইসলামপন্থীদের জন্য মূলত প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজ গ্রহণ করে, মুমিনদের ছাড়প্রদান ও ইসলামের প্রতিপক্ষদের সর্বাত্মক উপায়ে নিরলস বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রচেষ্টাসমূহকে একমুখী রাখা।

আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, জাতির উপর সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আধিপত্য। আর সমাধান হচ্ছে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আধিপত্যের পুনরুদ্ধার! তাই, এক্ষেত্রে আমাদের সকল বন্ধুত্ব, শত্রুতা, বিতর্ক ও মেহনত যেন হয়, এ মহান ও কষ্টসাধ্য ফলাফল অর্জনের মুয়াফিক।

সুতরাং, হঠকারী নয়, এমন প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাই থাকতে হবে দরদ, মুহাব্বাত ও সহমর্মিতা! প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য বিতর্ক বা খন্ডন হবে অব্জেক্টিভ, ইলম ও যুক্তিনির্ভর। আবেগ ও ইগোর বশবর্তী হয়ে আমরা কোনো মুসলিম ভাইকে বিগড়ে দিয়ে সেক্যুলার ও অন্যান্য ইসলামের শত্রুদের পুতুলে পরিণত করব না। আন্তরিক ঈমানদারদের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ অবস্থান হোক—"বৈরীতা নয়, ভ্রাতৃত্ব"!

সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে দ্বীনি মেহনতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক প্রদত্ত 'আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছেন মুসলিম হত্যা করতে' শীর্ষক বার্তায় উল্লেখিত কিছু কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

> "মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা, তাদের হক নষ্ট করা, তাদের সম্পদ দখল করা, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা; কখনই ঐক্য সৃষ্টি ও অনৈক্য দূর করার কোনো মাধ্যম নয়। ঐক্য আসবে মুসলমানের সামনে বিনয়ী হওয়ার দ্বারা, তাদের খেদমত করা দ্বারা, তাদেরকে সম্মান করা দ্বারা, তাদের মাঝে আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে।
>
> কোন জামাআতের অধীনস্থদের অন্য জামাআতের অধীনে দ্বীনের কাজ করার স্বাধীনতা খর্ব করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না মুসলমানরা একজন ব্যক্তিকে (নেতা হিসেবে) মান্য করতে একমত হয়।
>
> কারণ দ্বীনি কাজসহ সমস্ত ইবাদাত পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে হয়, জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে নয়। আর মুমিনদের জন্য শর্ত পূরণ করা জরুরী।
>
> তাই যে ব্যক্তি কোন দলের সাথে দ্বীনের কাজ করার বাইআত ও অঙ্গীকার করেছে সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার আমীরদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বিষয়ে দায়িত্বমুক্তি ও দলে না থাকার ঘোষণা না দিবে। আর আমিরদের জন্য তার পথে বাধা হওয়া জায়েয নেই। তারপর সে যেখানে, যাদের সাথে কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রেও বাধা দেয়া জায়েয নেই। জামাতবদ্ধ ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়াই হলো মূলনীতি। তাই বান্দা যার সাথে চায়, যেখানে থেকে চায় – সেখানে থেকেই ইবাদাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। এই ইসলামি মূলনীতির মাধ্যমে ইসলামের কাজগুলো সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।"

এছাড়া, ইমাম উসামা আবু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

> "আমি মনে করি—(আন্দোলনের) এই অভূতপূর্ব সফলতা ও অগ্রগামিতার পেছনে একটি বড় কারণ এই যে, (আমাদের তানজিম) সবসময় অন্যান্য তানজীম ও জামাআহর সাথে সু-সম্পর্ক ও সমঝোতা বজায় রেখে চলে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাওফীকের পর বলবো—আমার এই অতি ক্ষুদ্র বয়সে দেখেছি, সর্বদা আমাদের আগ্রহ ছিল আমাদের সকল মেহনত এবং শ্রম যেন আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। কোনো মু'মিনকে, ইসলামি কোন দলকে আমরা কখনোই প্রতিপক্ষ বানাবো না।
>
> মুসলিম ভাইদের সাথে কখনোই তর্কে জড়াবো না। তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবো না। ইসলামি সব দলের সাথে আমাদের থাকবে সমঝোতা, সহমর্মিতা; নিয়তের বিশুদ্ধতা।"
>
> وَ قُلِ اعۡمَلُوۡا فَسَیَرَی اللّٰهُ عَمَلَکُمۡ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ وَ سَتُرَدُّوۡنَ اِلٰی عٰلِمِ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَۃِ فَیُنَبِّئُکُمۡ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ
>
> "আর বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯:১০৫)

তাই ইসলামের প্রধানতম প্রতিপক্ষ সেক্যুলার আধিপত্যের অবসানকে সামনে রেখে ঐক্যের সূত্র হচ্ছে—প্রত্যেক তাওহিদবাদী মুসলিম (চাই কিছু পাপ ও বিদআতে লিপ্ত) ব্যক্তি বা দল যদি সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা, আধিপত্য ও সংস্কৃতির পতনে সম্মত হয়, ইসলামের কর্তৃত্বের দাবিতে আন্তরিক হয় তবে,

১) তাদেরকে এই সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিরোধিতায় লেগে থাকতে হবে। সকল সামর্থ্য ও সংকল্পকে পুঁজি করে। কেননা, শায়খ নাদভি (রহ.) চমৎকারভাবে স্পষ্ট করেছেন, 'মানবীয় ফিতরাতেই এটা রয়েছে যে, কেবল শত্রুতার মাধ্যমেই ঐক্য অর্জন করা যায়। যার ফলে সকল জাতিগোষ্ঠীই কওমকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে শত্রুর সন্ধান করে থাকে। হোক তা কাল্পনিক বা বায়বীয়।'

আর,

২) নিজেদের পারস্পরিক সমালোচনা ও ইসলাহের স্থানে সম্ভাব্য কোমলতা ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। মুমিনদের মধ্যকার মতপার্থক্যকে বিবাদে পরিণত করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ভুলকে ভুল বলা বা প্রয়োজনীয় ইলমি সমালোচনা তো হবেই, তা কাম্যও বটে। বিপরীতে, প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা, বিগড়ে দেয়া এবং শত্রুর পুতুলে পরিণত করার আত্মঘাতী প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে।

ইসলাম ও আহলে হক কোনো জনপদে শক্তিশালী এমন অবস্থায় ফিকহ একরকম; আর ইসলাম ও আহলে হক দুর্বল ও সংশয়গ্রস্ত, এমন অবস্থায় ফিকহ আরেক রকম। ঢালাও চিন্তা ও মানসিকতা থেকে আমাদের দূরে থাকা আজ অপরিহার্য!! কেননা, তা সহযোগী কমায়, শত্রু বাড়ায়।

খাইরে উম্মাহকে দেয়া সাক্ষাৎকারে, এক প্রশ্নের উত্তরে, শায়খ উমার মাহমুদ উসমানের (شیخ ابو قتاده فلسطینی) কথার সারমর্ম হলো,

> "সেক্যুলার শাসকের অপসারণের ব্যাপারে যদি মানুষ একমত হয়; তবে, তা রিদ্দার বিরুদ্ধে হবে, না জুলুম বা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে হবে—তা নিয়ে যদি ইখতিলাফ/মতপার্থক্য হয়, তবে সেটা আপাতত বড় কোনো সমস্যা নয়।

যেমন, আহমাদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে আহলে আরবরা অবস্থান নিয়েছিলেন ‘রিদ্দাহর বিরুদ্ধে’ মনে করে। আবার, ইমারাতে ইসলামিয়ার এক্ষেত্রে অবস্থান ছিল যে, এই অভিযান “বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে”।

এমতাবস্থায়, সেক্যুলার শাসকের বিরুদ্ধে সামরিক ও সামগ্রিক অবস্থানের কারণ নিয়ে ইখতিলাফ করে আমাদের একে অপরের বিরুদ্ধচারণ করা উচিত নয়। এবং একে অপরের ভুল ধরে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ইখতিলাফ আহলে ইলমের মাঝে সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল।

আমাদের উচিত এই ইখতেলাফকে সহজভাবে গ্রহণ করে মূল কাজ (তথা, সেক্যুলার শাসকের অপসারণের মাধ্যমে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা) সম্পন্ন করা। যেহেতু কাজটির ব্যাপারে কারো মাঝে ইখতিলাফ নেই।”

যদি ইসলামি সংগঠনগুলো ও নেতৃত্ব শাসনব্যবস্থার কুফরের ব্যাপারে একমত হয় এবং সুস্পষ্ট ভ্রান্ত আকিদার না হয়; তবে, শাসকদের তাকফির করার বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা তৈরির পরিবর্তে, আমাদের দলিলভিত্তিক মত জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করাই কাম্য। বরং, যে বা যারাই ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দাওয়াহ, লেখালেখি, ওয়াজ এবং মিডিয়া, সামরিক বা সাংগঠনিক পদক্ষেপের মতো নানাবিধ প্রক্রিয়ায় সেক্যুলার শাসনের অপসারণ চান, তারাই এখানে উদ্দিষ্ট। তবে, ইরজা, অন্যায় তাকফির ও অন্যান্য ভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রতিহতকরণে বাস্তবসম্মত মেহনত জারি রাখাও, অগ্রগামী আন্দোলনের অপরিহার্য দায়িত্ব বটে।

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

“কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের উপর আবশ্যক হলো দীনের সংস্কার করা এবং তার সজীবতা ও ঔজ্জল্য প্রথম রূপে ফিরিয়ে আনা। একারণে আমাদের উপর আবশ্যক হলো, শাখা-প্রশাখা নিয়ে ধোঁকায় না পড়া। বরং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, দ্বীনের উসূল বা মূলনীতি কী এবং এই শাখা ও অংশগুলো পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি কি?

কোনো গোষ্ঠী কোনো মাসআলায় আমাদের সহমতাবলম্বী হওয়ার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, এই জামাত আমাদের দলভুক্ত এবং আমরা তাদের দলভুক্ত, আমাদের যে অধিকার আছে, তাদেরও সেই অধিকার আছে এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব আরোপিত হবে, তাদের উপরও সে দায়িত্ব আরোপিত হবে। বরং তা হবে উক্ত দলের মানহাজ এবং তাদের আল্লাহর দ্বীন বোঝার পদ্ধতি দেখে।

আমাদের উম্মাহর এমন অনেক পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে, যখন জিহাদ ও যুদ্ধের নেতৃবৃন্দের মাঝে অনেক কঠিন কঠিন বিদআতি বিষয় ছিল। রিজালের কিতাবসমূহ তাদের প্রশংসা করেছে এবং তাদের উত্তম স্মৃতিগুলো এখানো মানুষের মুখ ও ঠোঁটে জীবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু আমাদেরকে তাদের বিদআতি দিকটি এবং তা থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়া এবং (উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সময়ে) তার বিরোধিতা করা থেকেও দৃষ্টিনত করে ফেললে চলবে না। যেন আমরা প্রকৃত বিষয়টির অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি এবং এগোষ্ঠীর প্রশংসা ও সমর্থনের উষ্ণতায় হারিয়ে না ফেলি।”

তাই, ইসলামপন্থীদের সকলকেই সেক্যুলার আধিপত্য ও চক্রান্ত প্রতিরোধ ও দূরীকরণে মূল মেহনত দেয়া উচিৎ। এবং আহলে ইসলামের আন্তরিক ব্যক্তি ও দলসমূহকে (চাই তাদের ভুলত্রুটি থাকুক) অন্যায় আক্রমণ পরিহার করে, সহনীয় ইখতিলাফগুলোকে পাশে রেখে অগ্রসর হওয়া জায়গা খোঁজা উচিৎ।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক দাওয়াহ ও মানহাজকে সংগঠিত মেহনতের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়াকে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যায়িত করা থেকে যেমন বিরত থাকা উচিৎ, একইভাবে সাংগঠনিক মেহনত করতে গিয়ে সংগঠনকে গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দেয়াও ইসলামপন্থীদের জন্য পরিত্যাজ্য একটি বিষয়। আদর্শ, চিন্তা, অভিরুচি ও মেজাজের স্বাভাবিক মতপার্থক্যকে দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতার ট্যাগ লাগানোর মতো নিচু মানসিকতা যেমন কাম্য নয়, একইভাবে সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মে একীভূত হওয়া থেকে অকারণে বা হঠকারিতাবশত দূরে থাকাও সুন্দর মানসিকতা নয়।

বরং, কাম্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তি, জামাত বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ জায়গা থেকে সমাজের উপর চেপে বসা কুফর ও মুনকারের অপসারণ এবং তাওহিদের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার পথে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাবে; অন্যান্য মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শ, সমন্বয় ও সহযোগিতা জারি রাখবে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতি ও সময়ে ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের স্বার্থে একক প্ল্যাটফর্মে স্বকীয়তা ও কল্যাণ বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِیَآءُ بَعۡضٍ ؕ اِلَّا تَفۡعَلُوۡهُ تَکُنۡ فِتۡنَۃٌ فِی الۡاَرۡضِ وَ فَسَادٌ کَبِیۡرٌ

> "আর যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক, যদি তোমরা তা না কর তবে জমিনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।" (সূরা আল-আনফাল, ০৮:৭৩)

আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

---

[1] শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি রচিত—"تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولن تموت" নামক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত